নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নাগরিক ভাবনা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক–সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৫ অক্টোবর ২০১৬)

এক.

আমাদের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: ''প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। তবে সে নির্বাচন হতে হবে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য। বস্তুত গণতান্ত্রিক শাসনের প্রথম ও অতি আবশ্যকীয় পদক্ষেপ হলো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য তথা 'জেনুইন ইলেকশান' বা সঠিক নির্বাচন করতে আমরা আন্তর্জাতিকভাবেও অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারণ আমরা 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ' ও International Covenant on Civil and Political Rights-এ স্বাক্ষরদাতা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে এসব আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তিও মেনে চলতে হবে।

আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি অনুযায়ী জেনুইন ইলেকশানের কতগুলো পূর্বশর্ত রয়েছে। যেমন: (ক) সব ভোটার হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন; (খ) যেসব ব্যক্তি প্রার্থী হতে আগ্রহী, তাঁরা প্রার্থী হতে পেরেছেন; (গ) প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের ফলে ভোটারদের সামনে বিকল্প প্রার্থী ছিল; (ঘ) ভোট প্রদানে আগ্রহীরা নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন; এবং (ঙ) ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য তথা জেনুইন ইলেকশান পরিচালনার জন্য একটি সঠিক প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। এ লক্ষ্যে আমাদের সংবিধানে নির্বাচন কমিশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। আমাদের সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনকে চারটি সুস্পষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যেগুলো হলো: (ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান; (খ) জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান; (গ) সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ; এবং (ঘ) রাষ্ট্রপতি পদের এবং সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ। এসব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের কর্তব্য হলো, আমাদের সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কমিশনকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা প্রদান করা।

দুই.

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন গঠনের নির্দেশনা দেওয়া আছে। "১১৮। **নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা:** (১) 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া' বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন। (২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন। (৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং (ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না; (খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না। (৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন। (৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না। (৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।" সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে পুনঃনিয়োগ প্রদানের কোনো সুযোগ নেই। তবে বর্তমান নির্বাচন কমিশনারদের একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব।

সংবিধানের উপরিউক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক অন্য চার নির্বাচন কমিশনাকে নিয়োগ প্রদানের এখতিয়ার মহামান্য রাষ্ট্রপতির। তবে রাষ্ট্রপতিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই এ নিয়োগ দিতে হয়। উল্লেখ্য, আমাদের সংবিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করতে হয় [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)]।

লক্ষণীয় যে, সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে 'আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে' রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনে নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দেওয়ার জন্য একটি আইন প্রণয়নের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা গত ৪৪ বছরেও মানা হয়নি। তাই সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন না করে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদান করা না হলে, সেই নিয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সাম্প্রতিক এক আলোচনা সভায় ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, যিনি আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের একজন ছিলেন, এব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো মূলত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার মানদণ্ডও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারিত করে দেওয়া, যাতে **জেনুইন বা সঠিক নির্বাচনের জন্য সঠিক ব্যক্তিদেরকে নিয়ে কমিশন গঠিত হয়। তবে সঠিক ব্যক্তিদেরকে নিয়ে কমিশন গঠন করতে হলে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। আর সঠিক পদ্ধতি হবে সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী এলক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা, যাতে সৎ, যোগ্য, নিরপেক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিরা কমিশনে নিয়োগ পান। অতীতে সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে সঠিক ব্যক্তিদেরকে কমিশনের নিয়োগ না দেওয়ার কারণে সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন হলেও অনেক ক্ষেত্রেই কমিশনের সদস্যরা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।**

তিন.

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ২৩টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন পুনঃগঠন বিষয়ে সংলাপ করে একটি আইন প্রণয়ন অথবা প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কমিশনে নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যে পাঁচ সদস্যের একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম-কমিশনের চেয়ারম্যান এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানকে নিয়েএই অনুসন্ধান কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন।

তবে কমিশনে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের সংবিধানিক নির্দেশনা উপেক্ষা করে মন্ত্রিপরিষদ ২১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে চার সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ঘোষণা সম্বলিত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। পরবর্তীতে ২৪ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে জারি করা আরেকটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুসন্ধান কমিটির সদস্য হিসেবে আপিল বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোঃ নূরুজ্জামান, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জনাব আহমেদ আতাউল হাকিম এবং সরকারি কর্ম-কমিশনের চেয়ারম্যান এটিএম আহমেদুল হক চৌধুরীর নাম ঘোষণা করা হয়। প্রজ্ঞাপনে অনুসন্ধান কমিটিকে তাদের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে শুধু সংবিধানই নয়, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশকেও উপেক্ষা করা হয়। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গঠিত অনুসন্ধান কমিটির কোনো কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অতীতের দলীয় সম্পৃক্ততার অভিযোগও উত্থাপিত হয় (*প্রথম আলো*, ৩০ জানুয়ারি ২০১২)।

চার.

নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ নিয়ে আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক বিরোধ বিরাজমান। অতীতের প্রায় সকল নিয়োগ নিয়েই, বিশেষত দলীয় সরকারের অধীনে নিয়োগ নিয়ে পক্ষপাত দুষ্টতার অভিযোগ উঠেছে। এসব অভিযোগের অন্যতম কারণ হলো যে, অতীতে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে অনেক ক্ষেত্রে সঠিক ব্যক্তিদেরকে কমিশনে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। আর এই রাজনৈতিক বিতণ্ডা এড়ানোর লক্ষ্যে সম্প্রতি সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আবু হেনা কমিশনে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলকে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দেন (প্রথম আলো, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬), যার সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করি। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে বিতর্ক এড়ানোর লক্ষ্যে আমরা সংবিধান অনুসরণ করে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

আমাদের প্রস্তাব হবে সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রথমেই একটি আইন প্রণয়ন করা। এক্ষেত্রে ড. এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত গত নির্বাচন কমিশনের – যে কমিশন কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছিল – রেখে যাওয়া কমিশনে নিয়োগ সংক্রান্ত আইনের একটি খসড়া কাজে লাগানো যেতে পারে। খসড়াটি নিয়ে রাজনৈতিক দলসহ সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সংলাপের আয়োজন করে এটিকে চূড়ান্ত করা যেতে পারে।সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি এব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে।

বর্তমান খসড়াটিতে নির্বাচন কমিশন পুনঃগঠনের লক্ষ্যে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব রয়েছে, যে প্রস্তাবের সঙ্গে আমরা একমত। আমরাও পাঁচ সদস্যের একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব করছি। ভবিষ্যত রাজনৈতিক বাক-বিতণ্ডা এড়ানোর লক্ষ্যে আমরা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরকে কমিটির সদস্য করার প্রস্তাব করছি। একইসঙ্গে অনুসন্ধান কমিটির নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে আমরা এতে নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদেরকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব করছি। প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপিল বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতির সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মহাজোটের একজন, বিএনপির নেতৃত্বে গঠিত জোটের একজন, নাগরিক সমাজের একজন এবং গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি নিয়ে পাঁচ সদস্যের অনুসন্ধান কমিটি গঠনের আমরা সুস্পষ্ট প্রস্তাব করছি। এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদ্বয়ের বিরুদ্ধে দলপ্রীতির কোনো বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ যেন না থাকে।

অনুসন্ধান কমিটিকে অবশ্যই স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। স্বচ্ছতার খাতিরে কমিটি নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দানের জন্য জনগণের কাছে নাম সুপরিশ করার আহ্বান করতে পারে। এভাবে যাঁদের নাম সুপারিশ করা হয় তাঁদের সম্মতির ভিত্তিতে আইনে বর্ণিত যোগ্যতা-অযোগ্যতার মানদণ্ডের আলোকে অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগের যোগ্য সম্ভাব্য ব্যক্তিদের নামের একটি শর্টলিস্ট তৈরি করে গণশুনানির আয়োজন করতে পারে। গণশুনানিতে এ নাগরিকদের পক্ষে অনুসন্ধান কমিটির বিবেচনাধীন ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট আপত্তি থাকলে তা উত্থাপন করার সুযোগ থাকবে। গণশুনানিরপর অনুসন্ধান কমিটি প্রত্যেক শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন করে চিহ্নিত করে সর্বোচ্চ দশজনের নামের একটি প্যানেল রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে। একইসঙ্গে প্রেরণ করবে কোন যুক্তির/মানদণ্ডের ভিত্তিতে তারা প্যানেলটি তৈরি করেছেন তার একটি রিপোর্ট, যা নাগরিকদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হবে।

দশজনের নামের প্যানেল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ পাঁচজনের নাম সুপারিশ করবেন, যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ প্রদান করবেন। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত একজন নারী যেন নিয়োগ প্রাপ্ত হন। লক্ষণীয় যে, নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তবে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হলে অপেক্ষাকৃত যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ পাবার পথ সুগম হবে এবং এ ব্যাপারে বিতর্ক এড়ানো যাবে বলে আমরা মনে করি।

তবে সর্বাধিক সৎ, যোগ্য, নিরপেক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিশনের পক্ষেও সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না, যদি না প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন না করে এবং রাজনৈতিক দলগুলো দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন না করে। অর্থাৎ সঠিক নির্বাচনের জন্য সঠিকভাবে গঠিত সঠিক নির্বাচন কমিশন অপরিহার্য বা 'নেসেসারি' (necessary) হলেও তা যথেষ্ট বা 'সাফিশিয়েন্ট' (sufficient) নয়। অর্থাৎ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠিত হলেই চলবে না, এর জন্য আরও প্রয়োজন হবে সরকারের সদিচ্ছা ও নিরপেক্ষতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বশীলতা।

(১৫ অক্টোবর ২০১৬ **সুজন**–সুশাসনের জন্য নাগরিক আয়োজিত গোলটেবিলে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত)